সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) -এর মুখপত্র

১৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬ | website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org | মূল্য ৫ টাকা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা কোন পথে

জাতীয় প্রেসক্লাবে বাসদ (মার্কসবাদী) এর আলোচনা সভা

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু তারা রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কার না করে রাষ্ট্রের ইতিহাসকে বিকৃত করা শুরু করেন। জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারের নামে অনেক ভুয়া মিথ্যা মামলা ও হয়রানি করে বিচার প্রক্রিয়াকে লঘু করেছে। নির্বাচন হওয়ার পর বিএনপি সরকার সর্বসম্মত সংস্কারের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে এমনকি তাদের নির্বাচনী ইশতেহার লঙ্ঘন করেছে। জামায়াত এনসিপিও মুখে সংস্কারের কথা বললেও কার্যকর সংস্কারের সদিচ্ছা দৃশ্যমান নয়।

(জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ২য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ৩১ জুলাই বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ঢাবি শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা ঋতু ও বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এদেশের ছাত্র-জনতার বীরোচিত লড়াই, অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বহু প্রশ্ন ও বির্তক নিয়ে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা তাঁদের বক্তব্যের লিখিত রূপ এখানে প্রকাশ করলাম)

গত ৩১ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবের ৩য় তলায় আব্দুস সালাম হলে বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান: বৈষম্যহীন বাংলাদেশ ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে আলোচনা করেন গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা ঋতু এবং বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য। সভা পরিচালনা করেন

বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষাই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রাণ

– আনু মুহাম্মদ

আজকের এই অনুষ্ঠানের সংগ্রামী সভাপতি, উপস্থিত বন্ধুগণ। আপনারা সবাই কোনো না কোনোভাবে গণঅভ্যুত্থানের সাথে ছিলেন, গণঅভ্যুত্থানের অনেক আগে থেকেও বিভিন্ন লড়াইয়ের মধ্যে ছিলেন। গণঅভ্যুত্থানের পরে বহুজনের মধ্যে একটা হতাশা আছে, প্রশ্ন আছে। অনেকের মধ্যে এরকম আক্ষেপও আছে যে, এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কি আমরা আরও পেছনে চলে গেলাম? আরও অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল, এমনকি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী – তাদের দাপট তৈরি হলো কি বাংলাদেশে? তাহলে কি

● এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের কোনো আলামত নেই

– মোশাহিদা সুলতানা ঋতু

যদি গণঅভ্যুত্থান নিয়ে কথা বলতে হয়, প্রথমে প্রশ্ন আসে যে আসলে এর আকাঙ্ক্ষাটা কী ছিল? এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বহু রকমের বিশ্লেষণ আছে। কেউ বলছেন রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা, কেউ বলছেন কর্মসংস্থানের লড়াই, কেউ আবার বলছেন ফ্যাসিবাদী শক্তি পতন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা এমনভাবে পুনর্গঠন করার লড়াই যেন এই ধরনের স্বৈরাচারী শাসক আবার এখানে প্রশ্রয় না পায়। সবগুলোই আসলে আকাঙ্ক্ষা ছিল।

আমরা যখন বলি রাষ্ট্র সংস্কার, এটা কিন্তু একটা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, রাষ্ট্রের কাঠামোর সংস্কার।

এর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রধানতঃ

● এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হলো না কেন?

– মাসুদ রানা

আপনারা আমাদের শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দের আলোচনা শুনেছেন। বক্তাদের কথা শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম যে, কী একটা সময় আমরা অতিক্রম করেছি! দুই বছর আগে আজকের দিনের কথা ভাবুন। তখন আমরা কেউ জানতাম না যে আমরা কে বাঁচব, কে মরব। একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে আমরা ছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে একটা অনমনীয় মনোভাব নিয়ে আমরা লড়াই করেছি। এই গণঅভ্যুত্থানে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা সর্বশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। শুধুমাত্র এই গণঅভ্যুত্থান নয়,

● এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

সৌদি নেতৃত্বাধীন প্রতিরক্ষা জোটে যোগদান বাংলাদেশের জন্য কতটা নিরাপদ

গত ৩০ জুলাই সৌদি আরব ৪৩টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে রিয়াদে এক বৈঠকে বহুজাতিক সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠনের উদ্যোগ ঘোষণা করে। সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৫১টি দেশকে বৈঠকে ডেকেছিল। এর মধ্যে অংশ নিয়েছে ৪৩টি দেশ। ৪৩টি দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ও বিবৃতি দিয়ে জোটটিকে সমর্থন জানিয়েছে মাত্র ১৪টি দেশ। এশিয়া মহাদেশ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে মাত্র দুইটি দেশ – বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। এই জোটের ঘোষিত লক্ষ্য হলো বাব আল-মান্দেব প্রণালী, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগর -এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের সংযোগস্থল এই বাব আল-মান্দেব প্রণালীর উপর বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের প্রায় ৬১% রপ্তানি (মূলত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাগামী) ও প্রায় ৮% আমদানি এই একই রুট ব্যবহার করে আসে। যদি বাব আল- মান্দেব বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে অধিকাংশ জাহাজকে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তের Cape of Good Hope ঘুরে যেতে হয়। এর ফলে যাত্রাপথ সাধারণত ১০-১৫ দিন পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এতে জ্বালানি ব্যয় ও বীমা খরচ বাড়ে, কন্টেইনার ভাড়া বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনা ঘটলে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অনেকখানি পিছিয়ে পড়বে।

একথা যেমন সত্য তেমনি এও সত্য যে, এই সংকট বাংলাদেশের একার নয়। সুয়েজ খালের প্রবেশদ্বার হওয়ায় এটি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যকার আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান ধমনী। এই অংশের নিরাপত্তা নিয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ৩০-৩৫টি দেশই চিন্তিত। ফলে এই রুটকে নিরাপদ রাখার জন্য নানা ধরনের সামরিক জোট এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে ও ক্রিয়া করছে।

এছাড়া যে ১০/১২টি দেশের অস্তিত্ব ও অর্থনীতি এই অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল – তাদের সকলে এই নিরাপত্তা জোটভুক্ত হয়নি। আমন্ত্রিত ৫১টি দেশের মধ্যে ৮টি দেশ বৈঠকে উপস্থিত হয়নি, উপস্থিত দেশগুলোর মধ্যে ২৯টি দেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি, চুক্তিকে সমর্থন করে প্রেস কনফারেন্সেও অংশ নেয়নি। সেখানে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়া একটা বিস্ময়কর ঘটনা। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বাব আল-মান্দেব প্রণালীর সম্পর্ক বাংলাদেশের চেয়ে কম নয়। ভারতের মোট পণ্য বাণিজ্যের প্রায় ৮০% (বিশেষ করে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে) এই করিডোরের সাথে সংযুক্ত। তারপরও ভারত এই জোটকে সমর্থন দেয়নি। শুধু ভারত নয় – চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), ওমান, অধিকাংশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র (যদিও EU প্রতিনিধি বৈঠকে ছিল) এই বৈঠকে যোগ দেয়নি। সৌদি আরব এই নিরাপত্তা জোট তৈরি করতে চাইছে কেন- সেই বিষয়টিও গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার আছে বলে আমরা মনে করি। মধ্যপ্রাচ্যের তেল পরিবহনের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রুট - হরমুজ প্রণালী ও বাব-আল মান্দেব প্রণালীর মধ্যে হরমুজই দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের প্রধান জ্বালানি রুট ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ইরান যুদ্ধের ফলে এই পথের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে লোহিত সাগর-বাব আল-মান্দেব করিডোরের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়েছে।

কিন্তু ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা ইতোমধ্যে এই প্রণালীতে সৌদি জাহাজে হামলা করেছে ও নৌ অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে। ফলে সৌদি আরব এই ঘটনাকে সামনে রেখে এই জোট গঠনের উদ্যোগ নেয়। সৌদি আরব হুথিদের হাত থেকে এই প্রণালী রক্ষার কথা বলে নিরাপত্তা জোট গঠনের কথা বললেও তাদের উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত ও গভীর বলেই অনেকে ধারণা করেন। কারণ সামরিক জোট কোন স্বাভাবিক বিষয় নয়। উপরন্তু এই অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমেরিকার নেতৃত্বে Prosperity Guardian ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃত্বে Operation Aspides- নামে দুইটি সামরিক উদ্যোগ ক্রিয়াশীল আছে।

● এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

● ১ম পৃষ্ঠার পর

বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষাই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রাণ

গণঅভ্যুত্থান ভুল হলো? এই সমস্ত প্রশ্নগুলো এখন বিভিন্নভাবে আমরা শুনি বা আসে।

আমরা যারা গণঅভ্যুত্থানে বিভিন্নভাবে ছিলাম, আমরা এখন সাধারণত দুই দিক থেকে আক্রান্ত হই। একটা আক্রমণ হলো – 'আপনারাই তো এই সর্বনাশটা করলেন, প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতায় নিয়ে আসলেন।' আবার আরেকটা আক্রমণ আসে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে। তারা বলতে চান যে, এখানে যারা বাম ঘরানার লোকজন, গণঅভ্যুত্থানে এদের কোনো ভূমিকাই ছিল না। এরা হচ্ছে একেবারেই প্রান্তিক, তারা আসলে এখানে কোনো পক্ষই না। সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট কিংবা বাম গণতান্ত্রিক জোট – এরা এখন জোর-জবরদস্তি করে নিজেরা একটু জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে দুই দিক থেকেই আক্রমণ আসছে।

আমরা এদেশে জাতীয়ভাবে যে তিনটা বড় আকারের গণঅভ্যুত্থান দেখলাম – ৬৯, ৯০ এবং ২৪-এ – তিনটারই পেছনে উন্নয়নের একটা বড় কাহিনী আছে। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে সামরিক ক্যু করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি তার শাসনের উন্নয়ন দশক পালন করেছিলেন ১৯৬৮ সালে। উন্নয়ন দশক খুবই সাড়ম্বরে পালিত হয়েছিল সারা পাকিস্তান জুড়ে। উন্নয়ন দশকও শেষ হলো এবং তারপরেই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আইয়ুব খানের পতন হলো।

তারপরে আমাদের আরেকটা উন্নয়ন দশক হলো এরশাদের সময়। এরশাদ ১৯৮২ সালে আইয়ুব খানের মতো সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতায় আসল। তার শাসনের অবশ্য দশক পূর্ণ হয় নাই, দশকের কাছাকাছি তিনি গিয়েছেন। তার সময়েও নানা উন্নয়নের কথা আমরা শুনেছি। উপজেলা হলো, জেলা হলো অনেকগুলো, অনেক রকম বিল্ডিং ও নির্মাণ কাজ হলো। দশক পূর্ণ হওয়ার আগেই তারও পতন ঘটল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালে।

শেখ হাসিনা তো আইয়ুব খান বা এরশাদের মতো না – নির্বাচন করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু ২০১৪ থেকে ছিল অনির্বাচিত সরকার এবং সেই সময়ই 'উন্নয়নের মহাসড়ক', 'কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়ন' – এই সমস্ত কথাবার্তা আমরা শুনতাম। পদ্মা সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, অনেকগুলো হাইওয়ে, মেট্রোরেল – ইত্যাদি হলো। বলা যায়, কনস্ট্রাকশন বুম হলো একটা। কিন্তু তিনিও ক্ষমতায় টিকতে পারলেন না।

এখানে একটা প্রশ্ন আসে। প্রত্যেকটা জায়গায় উন্নয়নের পরে কেন গণঅভ্যুত্থান হয়? মানুষ কেন উন্নয়নের সাথে থাকে না? মানুষ উন্নয়নের বাইরে কেন যায়? উন্নয়ন যারা করে, তাদের বিরুদ্ধে মানুষ কেন ফুঁসে ওঠে? তাহলে কী ধরনের উন্নয়ন হলো সেটা?

শেখ হাসিনা তাঁর সময়ের উন্নয়নের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, মার্কিন দূতাবাস এবং অন্যান্য বহুজাতিক কোম্পানি – সবার কাছে খুবই সম্মান পাচ্ছিলেন। কারণ সব রকম প্রতিবাদ দমন-পীড়ন করে, স্বৈরশাসনের মধ্য দিয়ে দেশকে যে উনি চালাতে পারেন – সেটার প্রমাণ উনি রেখেছেন। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র কিংবা অন্যান্য যত ধরনের উন্নয়ন প্রজেক্ট আছে, মেগা প্রজেক্ট আছে, একের পর এক তিনি করে যাচ্ছেন। কেউ ঠেকাতে পারছে না, কোনো প্রতিবাদ কেউ করতে পারছে না – বহুজাতিক পুঁজির জন্য এই ধরনের নেতৃত্ব দরকার। দেশের মধ্যে যে নতুন ধনিক শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, তাদের জন্য এরকম নেতৃত্ব দরকার। সুতরাং দেশের ধনিক শ্রেণি, আন্তর্জাতিক ধনিক শ্রেণি, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো – প্রত্যেকেই শেখ হাসিনাকে মাথায় তুলে রেখেছে।

কিন্তু এটাও টিকল না, যেমন আগেরগুলোও টেকে নাই। না টেকার কারণ হচ্ছে উন্নয়নের অন্যপিঠ। এই সমস্ত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে, কোনো সন্দেহ নাই। ষাটের দশকে বাংলাদেশে, পাকিস্তানে পুঁজিবাদের যে অবস্থা ছিল, এই শেখ হাসিনার আমলে সেটা অনেক বিকশিত হয়েছে। পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে, ধনিক শ্রেণি তৈরি হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে বৈষম্য বেড়েছে, প্রাণ-প্রকৃতি- পরিবেশের একটা বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু যাকে বলা হয় ডিসেন্ট জব, একটা সম্মানজনক কর্মসংস্থান – সেটার জায়গা তৈরি হয় নাই। বরং ভয়ঙ্কর রকম লুণ্ঠন ও সম্পদ পাচার হয়েছে। আর সেগুলো করার জন্য দমন-পীড়ন হয়েছে, স্বৈরশাসন এসেছে। এসব কারণে মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ, সেই ক্ষোভ থেকে এই বিস্ফোরণটা হয়েছে।

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের সময়ে স্পষ্ট কোন ঘোষণা বা নেতৃত্ব ছিল না, যেমন ৬৯-এ কিংবা ৯০-এ আমরা দেখেছি। আগের অভ্যুত্থানগুলোতে দলগুলো সামনে ছিল, দাবিদাওয়া সামনে ছিল এবং নেতারা চিহ্নিত ছিলেন। পরিষ্কার একটা চিত্র ছিল মানুষের সামনে। ২০২৪ সালে সেরকম অবস্থা ছিল না। একটা তরল অবস্থা ছিল। ছাত্রদের আন্দোলন থেকে এটা যে দ্রুতগতিতে গণঅভ্যুত্থানের দিকে গেল; এই দ্রুতগতিতে যাওয়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা যদি কারও থাকে, যদি কাউকে কৃতিত্ব দিতে হয়, সেটা শেখ হাসিনাকে দিতে হবে। কারণ ১৪ জুলাই ও ১৫ জুলাই থেকে যে অবস্থাটা তৈরি হলো, সেটা তো শেখ হাসিনার সৃষ্টি।

একনায়ক বা স্বৈরশাসকের মনে একটা কর্তৃত্ববাদ কিংবা ঔদ্ধত্য তৈরি হয়। তারা মনে করে যে আমি যা খুশি তাই করতে পারি। কিন্তু পারে নাই, কেন পারে নাই? কারণ তাঁর যে শেষ অস্ত্র, সামরিক বাহিনী কিংবা কারফিউ – এটা আর কাজ করছিল না। একটা দেশে, একটা সমাজে, মানুষ যখন কারফিউ ভঙ্গ করে, কারফিউ প্রত্যাখ্যান করে, তখনই সেটা হলো গণঅভ্যুত্থানের মুহূর্ত। আপনি ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করেন, 'চিলেকোঠার সেপাই' পড়লে দেখবেন, কারফিউ প্রত্যাখ্যান করে শ্রমিকরা বেরিয়ে আসছে, ছাত্ররা বেরিয়ে আসছে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা বেরিয়ে আসছে। আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, এত শক্তিশালী সেনাবাহিনী – সেটা আর কাজ করছে না। ১৯৯০-এ এরশাদের সেনাবাহিনীও কাজ করে নাই। এটা, এটা হচ্ছে মুহূর্ত। ওই মুহূর্তটা তখন তৈরি হয়েছিল।

এই ঘটনাগুলো কালার রেভোলিউশন না কিংবা ষড়যন্ত্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব করছে – এটা বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই কাজগুলো তো শেখ হাসিনার নির্দেশেই হচ্ছে। আন্দোলনকারী সবাই সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসী দেখামাত্র গুলি করতে হবে – এটা তো মার্কিন দূতাবাস থেকে বলা হয় নাই। এটা তো শেখ হাসিনা বলেছে। ফলে এই ঘটনাগুলো কোন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

গণঅভ্যুত্থানের পর জামায়াত কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় উগ্রবাদী শক্তিগুলো যে তাণ্ডব চালিয়েছে কিংবা তাদের যে দাপট তৈরি হয়েছে – এটা হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে নাই। তারা এই সমাজের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল এবং তারা আওয়ামী লীগের মধ্যেও ছিল। গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতন না হলে আওয়ামী লীগের মধ্যেই তারা কাজ করত, যেমন করছিল। আওয়ামী লীগের সময়ই হেফাজতের কথা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নামেই মোরাল পুলিশিং হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যে চুক্তিগুলো করছে, এই চুক্তিগুলো কি হঠাৎ করে করছে? এই চুক্তিগুলো তো অনেক আগে থেকেই হচ্ছে। গণঅভ্যুত্থানের পরে আজকে আমরা যে উগ্র ডানপন্থী শক্তি সমাবেশ দেখতে পাচ্ছি, এই শক্তি সমাবেশটা সেই ধারাবাহিকতারই ফল। এটা হঠাৎ করে আসেনি।

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে আলাদা কোনো রাজনৈতিক দলের ঘোষণা ছিল না। বৈষম্যহীন বাংলাদেশের প্রত্যাশা নিয়ে একটা গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। সেই বৈষম্যহীনতা বলতে কী বোঝায়? শ্রেণিবৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য, লিঙ্গীয় বৈষম্য – এগুলো থেকে মুক্ত একটা দেশ। যে কোন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য – সেটা ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, যাই হোক না কেন – সেটা থেকে মুক্ত একটা দেশ। এসব থেকে মুক্ত একটা দেশের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে এই আকাঙ্ক্ষা কী ধরনের আকাঙ্ক্ষা? এটা কি কোনো ডানপন্থী প্রত্যাশা হতে পারে? বৈষম্যহীন বাংলাদেশের চিন্তা, বৈষম্যহীন একটা সমাজের প্রত্যাশা কি কোনো ডানপন্থী বা মধ্যপন্থী এজেন্ডা হতে পারে? বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বলা মানেই হচ্ছে এটা আসলে একটা বামপন্থী এজেন্ডা। এটা বাম প্রত্যাশা, বামপন্থী চিন্তা। ডানপন্থী রাজনীতি, মতাদর্শ কখনো বৈষম্যহীনতার ওপরে দাঁড়াতে পারে না। ডানপন্থী রাজনীতি দাঁড়িয়ে থাকে শ্রেণি বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য, লিঙ্গীয় বৈষম্য, বিভিন্ন ধরনের জাতিগত বৈষম্যের ওপর। এটাই হচ্ছে ডানপন্থী রাজনীতি। আমরা যেটাকে ডানপন্থী রাজনীতি বলি, আর যেটাকে বৈষম্যবাদী রাজনীতি বলি – এই দুইটা আসলে একই রাজনীতি। মধ্যপন্থী মানে, ওই ডানপন্থী জিনিসটাকে কোনো না কোনোভাবে আড়াল করে একভাবে সেটাকে রেশনালাইজ করার চেষ্টা করার রাজনীতি।

তার মানে এই কথাটা আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে যে, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য থেকে সমাজের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষাটা প্রকাশিত হলো, যে প্রত্যাশাটা সামনে আসল – সেটা একেবারেই বামপন্থী প্রত্যাশা। কিন্তু যারা ক্ষমতার দাপট নিয়ে পরে সামনে আসল, তারা সবাই হচ্ছে বৈষম্যবাদী। তার মানে এখানে এই যে 'মিস-ম্যাচ'এই সমাজের মধ্যে; সমাজের প্রত্যাশা এবং সমাজের সংগঠিত শক্তি, এই দুইয়ের মধ্যে যে অসঙ্গতি কিংবা ভারসাম্যহীনতা – এটাই হচ্ছে বর্তমান সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজের প্রত্যাশার সাথে সংগঠিত শক্তির একটা দ্বন্দ্ব এখন দেখা দিচ্ছে। সেটারই ফলাফল আমরা এখন দেখছি।

আপনারা দেখবেন যে, দুইটা পরস্পরবিরোধী কথা এখন প্রচলিত আছে। ফেসবুকেও পাবেন, বাইরেও পাবেন। একটা হচ্ছে, বামপন্থীদের কোনো শক্তি নাই, বামপন্থীদের সাথে কোনো লোক নাই, বামপন্থীরা একেবারেই জনবিচ্ছিন্ন। আরেকটা হচ্ছে, বামপন্থীরাই দেশের জন্য একটা ভয়াবহ বিপদ নিয়ে আসছে, বামপন্থীরাই সর্বনাশ করছে। তো যার শক্তি নাই, সে কী করে বিপদ তৈরি করতে পারে? সে কী করে দেশের জন্য একটা এত বড় সর্বনাশ তৈরি করতে পারে? এই দুইটা কথা কিন্তু পাশাপাশি শুনবেন এবং সেই কারণে দেখা যায় যে, বাম এবং সেক্যুলারবিরোধী একটা অপপ্রচার সারাক্ষণ চলছে। কুৎসা দিয়ে কিংবা বিভিন্ন ধরনের মিথ্যাচার দিয়ে তাদেরকে যতটা সম্ভব কালিমালিপ্ত করার একটা ব্যাপক, সংগঠিত চেষ্টা এখন আমরা দেখতে পাই, যেটা সরাসরি গণঅভ্যুত্থানকে অস্বীকার করার শামিল। কারণ গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, সেটার জন্য যারা লড়াই করছে, সেটার স্বপ্ন যারা দেখছে, সেটার রাজনীতি যাদের – তাদেরকেই কোণঠাসা করার একটা সামগ্রিক চেষ্টা এটি। মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সাম্রাজ্যবাদী বড় প্রজেক্ট এখন চলছে, সেই প্রজেক্টের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন তৈরি হচ্ছে কিংবা বামপন্থীদের কণ্ঠস্বর দিনে দিনে সরব হচ্ছে, তখন কিন্তু এই প্রচারটাও বাড়ছে। সেখানে দেখবেন যে, আওয়ামী লীগ, জামায়াত, এনসিপি, বিএনপি সবাই ঐক্যবদ্ধভাবেই আক্রমণগুলো করছে। কাদের বিরুদ্ধে? যারা মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। তারা কারা? যারা ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছিল। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, সীমান্ত হত্যাকাণ্ড, নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিয়ে আন্দোলন করেছিল। সুতরাং এই অপপ্রচার এবং এই আধিপত্য – এই দুইটার একটা সুনির্দিষ্ট রাজনীতি এবং মতাদর্শিক জায়গা আছে।

এখানেই আমাদের কাজ। আমাদের এখন বহুমাত্রিক কাজ। একটা কাজ রাজনৈতিক দলের। সেটা হলো বাম রাজনৈতিক সংগঠিত শক্তি তৈরি করা। এটা একটা বড় কাজ। শ্রেণি প্রশ্নটাকে সামনে আনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণি প্রশ্ন যদি আজকে যথেষ্ট গুরুত্ব পেত, তাহলে এই যে ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা কিংবা ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে শোষকদের স্বার্থ রক্ষা করা তাদের জন্য সহজ হতো না। তাই শ্রেণি প্রশ্নটা সামনে নিয়ে আসা দরকার। নারী প্রশ্নটাকে সামনে আনা দরকার এবং সমস্ত কাজের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো দরকার। আদিবাসী, দলিত তাদের যে মবিলাইজেশন এবং তাদের যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি, সাংগঠনিক তৎপরতা – সেটা বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের যারা আছে তাদের মবিলিটি বাড়ানো দরকার। ইসলাম ধর্মের মধ্যেই অনেক মাইনরিটি আছে, ইসলাম ধর্মের মধ্যেই নিপীড়িত অনেক অংশ আছে। তারা শুধু আক্রান্ত না, তাদের রীতিমতো খুন করা হচ্ছে। তাদের পুরো আবাসস্থল, ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে দেওয়া হচ্ছে। মানে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে যে কেউ নিরাপদ থাকবে, তাও পারবে না। এরকম একটা অবস্থা। সেই প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমাদের বহুরকম কাজ আছে। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করার আছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উন্নয়ন সম্পর্কিত চিন্তা যদি আইয়ুব খান, এরশাদ, হাসিনার মতোই থাকে, মানে উন্নয়ন বলতে যে ধরনের উন্নয়ন তারা করে, সেই উন্নয়ন চিন্তার মধ্যেই যদি আমরা থাকি– তাহলে রাজনীতিও কিন্তু নতুনভাবে দাঁড়াতে পারবে না।

উন্নয়ন যদি পুরনো ধরনের চিন্তার মধ্যে থাকে, রাজনীতিটাও দেখা যাবে যে ওই পুরনো ধারার মধ্যেই থাকবে।

● এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬

সাম্যবাদের মূল নীতি: ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

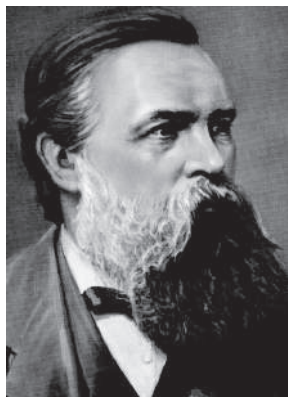

(ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের 'সাম্যবাদের মূলনীতি' মার্কসবাদী দর্শনের অন্যতম ভিত্তিমূলক রচনা। প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত এই লেখায় তিনি কমিউনিজম, শ্রেণিসংগ্রাম, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট ইশতেহার রচনার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণেও এই লেখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এঙ্গেলসের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তাঁর এই কালজয়ী রচনার অংশ বিশেষ পাঠকদের জন্য পুনর্মুদ্রণ করা হলো।)

প্রশ্ন : কমিউনিজম কী?

উত্তর : কমিউনিজম হল সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির জন্য আবশ্যক শর্তাবলি সংক্রান্ত মতবাদ।

প্রশ্ন : সর্বহারা শ্রেণি কী?

উত্তর : সর্বহারা শ্রেণি হল সমাজের সেই শ্রেণি যারা জীবনধারণের রসদ জোগাড় করে সম্পূর্ণভাবে ও কেবলমাত্র শ্রম বিক্রি করে, কোনও রকম পুঁজি থেকে পাওয়া লাভ দিয়ে নয়। যাদের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জীবন-মরণ, সমগ্র অস্তিত্ব নির্ভর করে শ্রমের চাহিদার উপর, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাল আর মন্দ পালা-বদলের উপর, লাগামছাড়া প্রতিযোগিতার ওঠা-পড়ার উপর। এক কথায় প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণি হল উনিশ শতকের শ্রমিক শ্রেণি।

প্রশ্ন : তা হলে কি সর্বহারা শ্রেণি সব যুগে ছিল না?

উত্তর : না। গরিব মানুষ আর মেহনতি শ্রেণি সবসময়েই থেকেছে। মেহনতি শ্রেণিগুলির বেশির ভাগই ছিল গরিব। কিন্তু আজকের দিনে যে পরিস্থিতিতে গরিব মেহনতি মানুষের বাস, তা আগে ছিল না। অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণি সব যুগে ছিল না। ঠিক যেমন এই ধরনের বল্গাহীন অবাধ প্রতিযোগিতার যুগও চিরকাল ছিল না।

প্রশ্ন : সর্বহারা শ্রেণির উদ্ভব হল কী ভাবে?

উত্তর : শিল্প বিপ্লবের ফল হিসাবেই সর্বহারা শ্রেণির জন্ম হয়েছিল, যে বিপ্লব গত শতাব্দীর (অষ্টাদশ) দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে দুনিয়ার সমস্ত সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্টিম ইঞ্জিন, সুতো কাটার নানাবিধ যন্ত্র, যন্ত্র চালিত তাঁত এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির বিপুল সম্ভার আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শিল্পবিপ্লব দ্রুতগতিতে বাস্তব রূপ নিতে থাকল। এই সমস্ত যন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় একমাত্র বৃহৎ পুঁজিপতিদের পক্ষেই তা কেনা সম্ভব ছিল। এই নতুন যন্ত্র এবং প্রযুক্তি উৎপাদনের পুরো পদ্ধতিটাকেই পাল্টে দিল। সাথে সাথে আগেকার কারিগর এবং হস্তশিল্পীদেরও উচ্ছেদ করে দিল। কারণ, হস্তশিল্পীরা তাদের পুরনো চরকা ও হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে যা উৎপাদন করত তার তুলনায় মেশিন এখন অনেক সস্তায় অনেক উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হল। এই সব যন্ত্রপাতিই শিল্পোদ্যোগকে পুরোপুরি তুলে দিল বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে এবং হস্তশিল্পীদের হাতে থাকা অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তিকে (যেমন- ছোট খাটো যন্ত্রাদি, তাঁত ইত্যাদি) নেহাত অকেজো জিনিসে পর্যবসিত করল। এইভাবে অচিরেই পুঁজিপতিরা হয়ে গেল সবকিছুর মালিক। শ্রমিকদের হাতে আর রইল না কিছুই। এইভাবেই বস্ত্রশিল্পে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সূচিত হল।

যন্ত্রপাতি ও কারখানা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথেই শিল্পোৎপাদনের সমস্ত শাখায়, বিশেষ করে পোশাক, মুদ্রণ শিল্প, মৃৎশিল্প ও ধাতুশিল্পে এই ব্যবস্থা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

কাজ ক্রমে ব্যক্তি শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্ত হতে থাকল। ফলে আগে যে কারিগর একাই কোনও একটি কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করত, এখন সে করে কাজের কেবল অংশবিশেষ মাত্র। এই শ্রমবিভাজন আরও সস্তায় ও দ্রুতহারে উৎপাদন সামগ্রী প্রস্তুত সম্ভব করে তুলল। এই শ্রমবিভাগ ব্যক্তি শ্রমিকের কাজকে পরিণত করল সরল ও অনবরত পুনরাবৃত্ত যান্ত্রিক ক্রিয়ায়। এই উৎপাদন কেবলমাত্র মেশিনের দ্বারা সম্ভব হল তাই নয়, তা আরও ভালভাবে সম্পন্ন হল। সুতাকাটা ও বয়নশিল্পে যা ঘটেছিল, সে ভাবেই একে একে শিল্পের সমস্ত শাখা বাষ্পশক্তি, যন্ত্রশক্তি ও কারখানা ব্যবস্থার আওতায় চলে এল।

এরই সাথে সমস্ত শিল্প বৃহৎ পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হল এবং শ্রমিকরা আগে যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করত তার থেকে বঞ্চিত হল। বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিশাল বিশাল ওয়ার্কশপ খুলে যত বেশি বেশি করে দক্ষ ক্ষুদ্র হস্তশিল্পীদের উৎপাটিত করতে শুরু করল, ততই প্রকৃত উৎপাদন শিল্প শুধু নয়, এমনকি হস্তশিল্পজাত উৎপাদনও কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় চলে এল। এর ফলে পুঁজিপতিদের খরচ যেমন অনেক বাঁচল, তেমনই শ্রমবিভাজনকে আরও বিস্তৃত করার সুযোগ মিলল।

এই রাস্তাতেই বর্তমান যুগের সভ্য দেশগুলিতে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন পূর্বপ্রচলিত প্রায় সকল প্রকার শ্রম, হস্তশিল্প এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছে, সমস্ত প্রকার শ্রমই ব্যয়িত হচ্ছে কারখানায়। এই ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হারে আগেকার মধ্যশ্রেণিগুলি, বিশেষত অপেক্ষাকৃত খুদে হস্তশিল্পীদের উত্তরোত্তর ধ্বংস করে দিয়েছে, সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে শ্রমিকদের আগেকার অবস্থান। দেখা দিয়েছে দু'টি নতুন শ্রেণি, যারা অন্যান্য সমস্ত শ্রেণিকে ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, এই শ্রেণি দু'টি হল :

(১) বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণি, এরা সমস্ত সভ্য দেশে ইতিমধ্যে প্রায় সামগ্রিকভাবেই জীবনধারণের সমস্ত সামগ্রীর এবং সেগুলি উৎপাদনের জন্য আবশ্যক কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আর কল-কারখানা ইত্যাদির উপর একচ্ছত্র দখল কায়েম করে ফেলেছে। এরাই হল বুর্জোয়া শ্রেণি বা পুঁজিপতি।

(২) সম্পূর্ণ সম্পত্তিহীন শ্রেণি, যারা তাদের বেঁচে থাকার উপায় ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য বুর্জোয়াদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এদেরই বলা হয় সর্বহারাশ্রেণি বা সর্বহারা।

প্রশ্ন : বুর্জোয়াদের কাছে সর্বহারাদের এই শ্রম বেচা চলে কোন শর্তে?

উত্তর : অন্য যে কোনও পণ্যের মতো শ্রমও একটা পণ্য এবং সে সব পণ্যের মতোই একই নিয়মে তার দাম স্থির হয়। আমরা দেখব – বৃহৎ শিল্প কিংবা অবাধ প্রতিযোগিতার রাজত্ব – উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম ভাবে – পণ্যমূল্য সবসময়ই মোটের উপর পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সমান। সুতরাং, শ্রমের মূল্যও শ্রমের উৎপাদন ব্যয়ের সমান।

কিন্তু শ্রম উৎপাদনের ব্যয় বলতে বোঝায়, সেই পরিমাণ জীবন ধারণের উপকরণের দাম, যতটুকু না হলে মজুর আগামী দিনে কাজ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারবে না এবং যা শ্রমিকশ্রেণিকে মরে শেষ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু দরকার, শ্রমের দাম হিসেবে তার থেকে একটুও বেশি মজুর পাবে না। অন্য কথায়, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সবচেয়ে কম পরিমাণই হবে শ্রমের দাম বা মজুরি। যেহেতু ব্যবসা কখনও ভাল চলে, কখনও মন্দ, তার ওপর নির্ভর করে মজুর তার শ্রমের মূল্যও কখনও বেশি, কখনও কম পায়। কিন্তু আবার ঠিকভাবে ধরতে গেলে, একজন শিল্পপতির সময় ভাল চলুক বা মন্দ, গড়পড়তা পণ্য উৎপাদনের ব্যয়ের তুলনায় সে পণ্যের দাম কখনওই বেশি বা কম পায় না। অনুরূপে মজুরও গড়পড়তা ন্যূনতম মজুরির থেকে কম বা বেশি পায় না। বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনের সমস্ত শাখার উপর যত বেশি পরিমাণে দখলদারি কায়েম করছে, তত কঠোরভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে মজুরির এই নিয়ম।

মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্র আর সরকার এক নয়

শিবদাস ঘোষ

এই রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে আমরা কী বুঝি? মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্র আর সরকার এক নয়। একটা গোলমাল এখানে সব সময় সৃষ্টি করে রাখা হয়। বোঝানো হয়, যেন সরকারই সব। যেন সরকারটা দখল করতে পারলেই রাষ্ট্রটাকে যেমন খুশি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। বলা হয়, যত নষ্টের মূলে রয়েছে সরকারে থাকা ওই সব বদ লোকগুলো। ওদের হটিয়ে দিয়ে যদি আমাদের মতো ভাল লোকেরা সরকারে যেতে পারি তবেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিপ্লব-টিপ্লবের হাঙ্গামার আর দরকার নেই। এ ধারণার মধ্যে না আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, না আছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক ধারণা। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা, অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নকে, তাকে উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিকে লঘু করে দেখা এবং মানুষকে ভোটের রাজনীতিতে আটকে রাখা। আপনাদের মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে কোনও বিপ্লবী আন্দোলন ভাবাই যায় না। এই যে শোষণমূলক ব্যবস্থা আমাদের দেশে টিকে রয়েছে, একে টিকিয়ে রেখেছে একটা রাষ্ট্রযন্ত্র। রাষ্ট্রের তিনটি শাখা, অর্থাৎ তিনটি স্তম্ভ – মিলিটারি, পুলিশ সহ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা, আর বিচারবিভাগ। এই তিনটিই রাষ্ট্রের স্থায়ী সংস্থা। ইলেকশনের দ্বারা সরকার পাল্টালেই এগুলো পাল্টায় না। সমঝোতা করে সরকার পাল্টালেও এগুলো যায় না। ক্যু করে সরকার পাল্টালেও যায় না। এর একটা কি দুটো ব্যক্তি এ-দিক ও-দিক হতে পারে মাত্র। রাষ্ট্র হচ্ছে অনেকটা যন্ত্রের মতো। আর সরকার হচ্ছে সেই যন্ত্রের পরিচালক, ইঞ্জিনিয়ার, অপারেটার বা মিস্ত্রি। এক একটা বিশেষ রাষ্ট্রযন্ত্রের ধরনধারণ, কায়দাকানুন, মানসিক ধাঁচা, নিয়মকানুন, চলবার রীতি নীতি – তার তিনটি স্থায়ী সংস্থা নিয়ে এক ধাঁচে বাঁধা। যেমন করে একটা মেশিন, তার বিভিন্ন পার্টস একটা নিয়মে জোড়া দেওয়া হয় এবং একই নিয়মে কাজ করে। অপারেটারকে সেই নিয়ম মেনে কাজ করতে হয়। সেই মেশিন দিয়ে সে অন্য কাজ করতে পারে না। যেমন একটা কাপড়ের কল, সে শুধু কাপড়ই বুনবে। অপারেটার ভাল হলে, বা তাঁতি ভাল হলে, ভাল কাপড় বুনবে অল্প সময়ে। তাঁতি খারাপ হলে, অজ্ঞ হলে কম কাপড় বুনবে, সময় নেবে অনেক। এইটুকু মাত্র পার্থক্য।

ঠিক সেই রকম পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থায় শোষণ করাই সম্ভব। শোষণটা মিষ্টি করে করবে, সহ্য করিয়ে করিয়ে নিয়ে করবে, এবং শোষণটা করবার সময় তারই সঙ্গে মলম মাখাতে থাকবে কি না, সেটা আলাদা কথা। একদল শোষণ করে চাবুক ঘুরিয়ে, আর একদল শোষণ করে, আবার তারই সঙ্গে যাদের শোষণ করে তাদের একটু ডাব খাওয়ায়, কমলালেবুর রস খাওয়ায়, মাখন খাওয়ায়। কিন্তু শোষণটা ঠিকই করে যায়। আর শোষণ নিয়ে প্রশ্ন করলে বলে, এই যে এত ডাব খাওয়াচ্ছি, এত ফলের রস খাওয়াচ্ছি, বুঝতে পারছেন না, কত ভালবাসি আপনাদের। আমি তো চেষ্টা করছি। কী করব, পারছি না। একটু সময় লাগবে। আর একটু সময় দিন।

এই করে করে দুশো বছর ব্রিটিশের অধীন ভারতবর্ষের জঞ্জাল হটাতে কংগ্রেস সাতাশ বছর পার করে দিল। আবার কংগ্রেসকে হটিয়ে যাঁরা আসবেন, তাঁরা আরও পনেরো-কুড়ি বছর নেবেন, আর আপনাদের ক্রমাগত জানিয়ে যাবেন – কী করব বলুন, কংগ্রেস তো সব শেষ করে দিয়ে গেছে, আমাদের সামলে উঠতে একটু সময় দিন। এর পর অন্য কেউ এলে একই ভাবে বলবে।

এই ভাবে সময় চলেই যাচ্ছে। জনসাধারণের অবস্থার কোনও বদল ঘটছে না। শোষণের জগদ্দল পাথরটা আরও শক্ত হয়ে চেপে বসছে। ফলে পুঁজিবাদী উদ্ধৎপাদন-সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য থেকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যদি মুক্ত করতে হয়, তা হলে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করাই হচ্ছে তার একমাত্র পথ।

(গত ৫ আগস্ট ছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের ৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকী। মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে তাঁর রচিত 'নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতি নয় বিপ্লবী আন্দোলনই মুক্তির পথ' পুস্তিকা থেকে নির্বাচিত অংশ মুদ্রণ করা হল)

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ও শিবদাস ঘোষের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এবং বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রয়াণ দিবসে বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মার্কসবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে অসামান্য অবদান রেখেছেন। একইভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংশোধনবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের সংগ্রামী জীবন, আদর্শ ও শিক্ষা আজও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বিপ্লবী কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস।

বর্তমান পুঁজিবাদী সংকট, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িকতা, ফ্যাসিবাদ এবং শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিপ্লবী লড়াই গড়ে তোলা ব্যতীত কোনো বিকল্প নেই। শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় পার্টির সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শাখার নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মক্ষেত্রে গৃহকর্মীদের হয়রানি বন্ধ ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিতের দাবিতে গৃহকর্মী সমাবেশ

গৃহকর্মী আনোয়ারা বেগমের নামে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, কর্মক্ষেত্রে গৃহকর্মীদের হয়রানি বন্ধ ও আইনী সুরক্ষার দাবিতে ৩০ জুলাই ২০২৬ চট্টগ্রামের ষোলশহরের রেল স্টেশন সংলগ্ন মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গৃহকর্মী অধিকার রক্ষা কমিটি। চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি আসমা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজু আহমেদ, এড.শফি উদ্দিন কবির আবিদ, তৌফিকা দেওয়ান লিজা।

ভুতুড়ে বিল ও লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে গাইবান্ধায় পল্লী বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও

বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা, দারিয়াপুর অঞ্চলের উদ্যোগে ২৯ জুলাই ভুতুড়ে বিল ও লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে পল্লী বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচিতে সংগঠনের অঞ্চল শাখার সভাপতি ডা. জব্বারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলার আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, জেলা সদস্য গোলাম ছাদেক লেবু, শাহাজালাল তোতা, আয়নাল প্রমুখ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন কাশিমপুর থানা শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গাজীপুরের কাশিমপুরে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন কাশিমপুর থানা শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইউনুস আলীকে সভাপতি এবং নাহিদ হাসানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট থানা কমিটির পরিচয় ঘোষণা করা হয়।

ক্যাম্পাসে ছাত্রদল-শিবিরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদল-শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হামলা ও শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্টের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের উদ্যোগে ৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সৌদি নেতৃত্বাধীন প্রতিরক্ষা জোটে যোগদান বাংলাদেশের জন্য কতটা নিরাপদ

● ১ম পৃষ্ঠার পর

সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র। এরপরও সৌদি আরব আলাদাভাবে কেন এই উদ্যোগ নিল – এই প্রশ্নটিকে গভীরভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এই অঞ্চলে মার্কিন মিত্রদের যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব বহন করতে হচ্ছে বলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে এবং সেটা যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানেই বাস্তবায়িত হবে – এ ধরনের কথাবার্তা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইরান যুদ্ধের ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিক্ষোভ হচ্ছে, অন্যদিকে টানা যুদ্ধে অস্ত্র ফুরিয়ে যাওয়ায় বাড়তি প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য কংগ্রেসে প্রস্তাব তুলতে হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসনকে। বিরোধীরা এ নিয়ে ট্রাম্পকে তুলোধুনো করছে। এই সমগ্র পরিস্থিতি এবং সৌদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এই প্রতিরক্ষা জোট গঠনের সাথে সম্পর্কিত। এই দীর্ঘমেয়াদী আশঙ্কার সাথে একটা আশু সংকটকেও উড়িয়ে দেয়া যাবে না। সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন এই নিরাপত্তা জোটে যোগ দিয়ে হুথিদের সাথে প্রক্সিওয়ারে জড়িয়ে পড়ার আগে যে কোন দেশই একাধিকবার ভাববে।

ধারণা করা যায়, এই সকল কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ওমান, আমিরাতসহ এই রুটের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, একইসাথে আমেরিকারও ঘনিষ্ঠ মিত্র – এরকম দেশই এ বিষয়ে এখনও নিরপেক্ষ বা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করছে। যেখানে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে বাংলাদেশের তুলনায় শক্তিশালী অনেক দেশই পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় – সেখানে তুলনামূলকভাবে দুর্বল সামরিক সক্ষমতার বাংলাদেশ কেন এ ধরনের জোটে যুক্ত হলো, এটা একটা বড় প্রশ্ন। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কখনই কোনো প্রতিরক্ষা জোটে যুক্ত হয়নি, যদিও নানা প্রতিরক্ষা জোটে যুক্ত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন দেশের চাপ ছিল। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধপরিস্থিতি ও আঞ্চলিক নানামুখী সংকটের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশ কেন সৌদি আরবের সাথে প্রতিরক্ষা জোটে যুক্ত হলো, তার সদুত্তর নেই।

আমরা অবিলম্বে এই বিষয়ে সরকারের ব্যাখ্যা দাবি করছি ও সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে একে আলোচনায় আনার জন্য আহবান করছি।

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬

দ্রোহযাত্রার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালিত

বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনে দ্রোহযাত্রা অব্যাহত রাখার আহ্বান

ঐতিহাসিক দ্রোহযাত্রার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ২ আগস্ট গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক ও গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের উদ্যোগে দ্রোহযাত্রা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে দ্রোহযাত্রা শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। আলোচনা সভায় সভাপ্রধান হিসেবে বক্তব্য দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা, তানজিমউদ্দিন খান, বাসদ (মার্কসবাদী)-র সমন্বয়ক মাসুদ রানা প্রমুখ।

দ্রোহযাত্রা থেকে জুলাই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার, জাতীয় স্বার্থবিরোধী সব চুক্তি বাতিল, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা, বন্ধ শিল্পকারখানা চালু, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু, পরিবেশবিনাশী প্রকল্প বন্ধ এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

বিদ্যুৎ বিতরণ বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার জনস্বার্থবিরোধী পরিকল্পনা বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাসদ (মার্কসবাদী)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা গত ২৩ জুলাই ২০২৬ এক বিবৃতিতে সরকার কর্তৃক সকল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিকে বেসরকারিকরণের আওতাভুক্ত করার পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সরকার দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে এবং এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো পরিচালনার প্রস্তাব আহ্বান করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুতের মূল্য উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে যার ভুক্তভোগী হবে সাধারণ জনগণ। আমরা এই অন্যায্য পরিকল্পনার বিরোধীতা করছি এবং দেশের বিদ্যুৎ খাতকে অপরিকল্পিত, জ্বালানী আমদানি-নির্ভর ও দেশী-বিদেশী লুণ্ঠনমূলক চুক্তির কবল থেকে বের করে একটি জাতীয় জনমুখী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করার দাবি জানাই।

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, অস্বচ্ছতা থাকলে তা নিরসনের জন্য বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়া কোন সমাধান হতে পারেনা। আমরা আশঙ্কা করছি যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ সুবিধা পাবার লক্ষ্যে আইএমএফ কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ২০২৭ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভর্তুকি পুরো তুলে দেওয়া ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর শর্তে এই ঋণ সুবিধা পেতে সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ করতে চায়। আমরা অবিলম্বে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণের গণবিরোধী পরিকল্পনা প্রত্যাহার করার দাবি জানাই।"

বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য দলের কনভেনশনকে কেন্দ্র করেগত ২৫ জুলাই ২০২৬ ঢাকার পল্টনে ফেনী সমিতি মিলনায়তনে দিনব্যাপী বাসদ (মার্কসবাদী) -র প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দলের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা। প্রতিনিধি সভায় সারা দেশের নির্বাচিত সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

চিত্রং বিলের মুখে স্লুইজ গেইট সংস্কার ও ধলতা প্রথা বন্ধ করার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন পূর্বধলা উপজেলা শাখার উদ্যোগে ১৮ জুন স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানের পূর্ব পূর্বধলা উপজেলা অফিসের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপজেলা সংগঠক সায়েদুর রহমান খান পাঠান লিংকন ও ময়মনসিংহ জেলা সংগঠক আরিফুল হাসান, স্থানীয় সংগঠক রোস্তম আলী, রুবেল মিয়া, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে কারমাইকেল কলেজে আলোচনা সভা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে কারমাইকেল কলেজে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ২১ জুলাই প্রজন্ম ভাস্কর্যের পাশে ছাত্র ফ্রন্টের টেন্টে আলোচনা সভা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্মৃতিচারণ, সঙ্গীত পরিবেশন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের কলজে সংগঠক নূর জামান ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন কারমাইকেল কলেজ ও রংপুর জেলার সাবেক সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু, জেলা সভাপতি সাজু বাঁসফোর, সাধারণ সম্পাদক জয় দাস, সহ-সভাপতি রাজু বাঁসফোর প্রমুখ। আলোচনা শেষে রচনা লেখা, কবিতা আবৃত্তি, প্রীতি ফুটবল ম্যাচসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জনগণের সম্পদ তুলে দেয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে

● শেষ পৃষ্ঠার পর

কারখানা প্রগতি ইন্ডাস্ট্রি, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, কর্ণফুলী পেপার মিল, দেশের একমাত্র বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার উৎপাদনকারী কারখানা জেমকো, বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল নির্মাণ কারখানা এটলাস, আশুগঞ্জ সার কারখানা, চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, কয়েকটি টেক্সটাইল মিল। এ কারখানাগুলোর অধীনে আছে কয়েক হাজার একর মূল্যবান জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পদ।

আগের তুলে দেয়া কারখানাগুলোর পরিস্থিতি কী

২০২০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার রাতারাতি ২৫টি রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল বন্ধ ঘোষণা করে। পরে রাষ্ট্রায়াত্ত ৬টি চিনিকলও বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে বন্ধ ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ৩০ বছরের জন্য বিভিন্ন শিল্পগ্রুপের কাছে লিজ দেওয়া হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত চালু হয়েছে অর্ধেক, অর্থাৎ সাতটি। ইজারা দেওয়ার সময় শর্ত ছিল, পাটকল ইজারা নিয়ে পাটজাত পণ্যই উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু তারা তা মানেনি। পাটজাত পণ্য উৎপাদনের শর্তে ইজারা দিয়ে চালু করা সাতটি পাটকলের মধ্যে চারটিতে পাটজাত পণ্য উৎপাদন হচ্ছে। অন্য তিনটিতে হচ্ছে সোয়েটার, জুতা, ছাতা, তাঁবু ও স্পেয়ার পার্টস।

বিএনপি সরকার এ বছর জাতীয় বাজেটে বন্ধ, রুগ্ন ও অলাভজনক কারখানা চালুর জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অতীতের অভিজ্ঞতা বলে,কারখানা চালুর নামে এ প্রণোদনা প্যাকেজের টাকা নিয়ে হরিলুট হবে। বাংলাদেশ প্রাইভেটাইজেশন কমিশন থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় 'বেসরকারিকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সমীক্ষা'। এতে দেখা যায়, ১৯৯৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া ৭৫টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১টিই বন্ধ। বেসরকারিকরণের নামে সস্তায় জমি ও যন্ত্রপাতি লুট করা হয়েছে, অথবা পরিত্যক্ত জমি দেখিয়ে বিপুল ব্যাংকঋণ নেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাকে পরিকল্পিতভাবে লোকসানে রাখা হয়

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানাগুলোকে সচেতনভাবে লোকসানী ও অকার্যকর হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশের সংকটের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা। এই কারখানাগুলোর প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন করা হয় না। পুরনো যন্ত্রপাতিতে কম উৎপাদন হয়। ফলে পণ্যের দাম বাড়ে। লোকসান গুণতে হয় কারখানাকে। সরকারি নীতিগত এই অবহেলার কারণে কারখানার লোকসান হতে থাকে। এভাবে রাষ্ট্র ও সরকার ধীরে ধীরে শিল্পকারখানাগুলোকে

● এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হলো না কেন?

● ১ম পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধেও আমাদের একটা ধারাবাহিক লড়াই ছিল। সেই সময় নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, জনজীবনের বিভিন্ন সংকট নিরসনের দাবিতে ধারাবাহিক লড়াই আমাদের দল করেছে।

লড়াইয়ের এই কালপর্বে আমরা একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলেছি – ফ্যাসিবাদ কোনো দল আনে না, ফ্যাসিবাদ আনে একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই আজকের দিনে অনিবার্যভাবে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। ফলে আমাদের লড়াইয়ের গতিমুখ তেমনই হওয়া উচিত, যাতে এই ব্যবস্থারও একটা পরিবর্তন আমরা সংঘটিত করতে পারি। এটা আমরা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়ে বারবার বলেছি। আমরা তখন দেখেছি যে, অনেকেই আওয়ামী লীগের পতন আর ফ্যাসিবাদের পতনকে সমার্থক ভাবছিলেন।

এরপর এই গণঅভ্যুত্থান হলো। এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এতে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটেনি, ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে মাত্র। শেখ হাসিনার শাসনামলে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি, প্রতিবাদ করেছি – তার অনেককিছুই আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় ঘটতে দেখেছি। এখন বিএনপি সরকারের শাসনামলে দেখছি। যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি, সেটা এই সংকটের সমাধান করতে পারছে না বলেই এমন ঘটছে। এই ব্যবস্থা এটা পারবেও না। বর্তমানে আমাদের দেশের মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা এবং চাওয়া, সেই চাওয়াকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যে ধরনের সমাজব্যবস্থা দরকার, সেটা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা না। এই ব্যবস্থা একটা ব্যর্থ ব্যবস্থা। এই সমাজব্যবস্থা মানুষের কোনো ধরনের সংকটের সমাধান করতে পারেনি – এটা বাংলাদেশের ৫৫ বছরের পুঁজিবাদী শাসনের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত। এই ৫৫ বছরের পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় জনজীবনের সংকটগুলো কোনোভাবেই সে দূর করতে পারেনি, বরং এই সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

ফলে এই ব্যবস্থাকে আমাদের চেনাটা খুব জরুরি। আমাদের এটা বোঝা দরকার যে সরকার এবং রাষ্ট্র – এই দুইটা আলাদা ব্যাপার। আমরা সরকারকে চিনি। আমাদের সরকারকে চেনানো হয়, আওয়ামী লীগকে চেনানো হয়, বিএনপিকে চেনানো হয়। একটা দল যায়, আরেকটা দল ক্ষমতায় আসে। ফলে এই সরকারের পরিবর্তন যে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন না, বরং এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিচালনা করছে এই সরকার, অনেকটা পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসেবে – এই দিকটা জনগণের সামনে নিয়ে আসা, জনগণকে এই জায়গায় সচেতন করা, সংগঠিত করা, ঐক্যবদ্ধ করা এই সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই জায়গা থেকে আমাদের লড়াইয়ের গতিমুখ আমরা নির্ধারণ করেছি। এর ভিত্তিতেই আমরা গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছি। এই কথাটা ঠিক যে, এই গণঅভ্যুত্থানে সমস্ত বামপন্থী দল যদি সর্বশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করত, তাহলে গণঅভ্যুত্থানের পরিণতির ক্ষেত্রে এবং গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ক্ষেত্রে বামপন্থীদের আরও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি হতো।

আমরা অভ্যুত্থানে সর্বশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করেছি শুধু আওয়ামী লীগ হঠানোর জন্য নয়। জনগণকে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা চেনানো ও তাদের মধ্যে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত সঠিক ধারণা তৈরি করা ছিল আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। আমরা সবসময় সেই জায়গা থেকেই আমাদের কর্তব্য ঠিক করেছি। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়েই বিরোধী দলগুলোর সর্বাত্মক ঐক্য হবে কি না, আমরা কাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হব, কাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হব না – এইগুলো প্রশ্নগুলো এসেছিল। আমাদের ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই আমরা তখন করণীয় নির্ধারণ করতে পেরেছিলাম।

এই বোঝাপড়াটা আমাদের ছিল যে, বিগত সময়ে সরকারি ক্ষমতায় থাকা বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলো এবং যে দলগুলো সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি করে – সেই দলগুলোর সাথে আমরা একই প্লাটফর্মে বা যুগপৎভাবে ঐক্যবদ্ধ লড়াই পরিচালনা করবো না। এইক্ষেত্রে একটা দূরত্ব আমরা রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি যখন আওয়ামী লীগের আক্রমণের শিকার হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছি। আপনাদের মনে থাকতে পারে যে, ২০২৩ সালের ২৮শে অক্টোবরে, নয়াপল্টনে বিএনপি'র মহাসমাবেশে একটা ভয়াবহ আক্রমণ হয়েছিল। ওই আক্রমণের পর যখন চারদিকে ছোটাছুটি, টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, নয়াপল্টন-পুরানা পল্টন-প্রেসক্লাব অঞ্চল রণক্ষেত্র, বিএনপির নেতাকর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছে – এইসবের মধ্যে আমাদের দলের উদ্যোগে এই হামলার প্রতিবাদে পল্টনে মিছিল বের করেছিলাম। অর্থাৎ বিএনপির ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা তখন দাঁড়িয়েছি। কিন্তু তাদের সাথে জোট বা যুগপৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই হবে – এটা আমরা মনে করি নাই। কারণ ফ্যাসিবাদ বলতে আমরা শুধু আওয়ামী লীগের দমন-পীড়ন-নির্যাতন বুঝিনি, আমরা ফ্যাসিবাদকে বুঝেছি একটা ক্যাটিগরি হিসেবে, একটা বৈষম্যমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলাফল হিসেবে। আমরা মনে করেছি, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এখানে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার। এই কাজটাই আমরা যত্নের সাথে করার চেষ্টা করেছি।

একইসাথে আমরা বলেছি রাজনৈতিক জোট বা কর্মসূচিতে আমরা এক হচ্ছি না, তার মানে এই নয় যে একটা একটা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠলে আমরা একইসাথে পথ চলতে পারব না। গণআন্দোলন ভিন্ন বিষয়। রাজপথের আন্দোলনের মধ্যে অনেক ধরনের ঐক্য হয়। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান। গণঅভ্যুত্থানের সময় কোন ব্যানার সামনে আছে, কোন দল এই লড়াইয়ে আছে – সেটা আমরা দেখি নাই। এই গণঅভ্যুত্থান ছিল জনগণের, জনগণের সাথে আমরা এই গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা রেখেছি। আমাদের এই রাজনৈতিক বোঝাপড়াটা খুবই স্পষ্ট ছিল। এ কারণে আমরা কোন দ্বিধায় ছিলাম না।

কিন্তু এই দ্বিধার মধ্যে অনেকেই পড়েছেন। বিগত সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো যে, বিভিন্ন সময়ে এই সকল দ্বিধার কারণে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে অনেকেই ভুল করেছেন। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন ১১ দল ভেঙে দিয়ে কয়েকটি বামপন্থী দল মৌলবাদ মোকাবেলার কথা বলে আওয়ামী লীগের সাথে জোট করেন। ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ আওয়ামী লীগের সাথে চলে গেল এই বলে যে, এখন মৌলবাদ আমাদের প্রধান শত্রু, তাকে মোকাবেলা করতে সর্বাত্মক ঐক্য বা বৃহৎ ঐক্য লাগবে। তখন ৬৪টি জেলায় একযোগে বোমা হামলা, বাংলা ভাইসহ চরমপন্থীদের উত্থান – এ ধরনের একটা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের ছিল। আমরা দেখেছি, এর মধ্য দিয়ে কিন্তু মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াই হয়নি, বরং মৌলবাদ আরও শক্তিশালী হয়েছে। ফলে লড়াইয়ের সময় আমি কোন শক্তিগুলোকে নিয়ে লড়াই করব, কারা আমার সত্যিকার অর্থে মিত্রশক্তি হবে – এই বিষয়গুলো আমরা নির্ধারণ করতে পেরেছিলাম।

বর্তমান সময়ে বামপন্থীদের কাজ কী? আজ মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে। এত লড়াই হলো, এত জীবনদান হলো, কোনো পরিবর্তন তো হলো না – এই প্রশ্নগুলো মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে। মানুষ দেখছে – সেই একই পুরনো পথে বাংলাদেশ হাঁটছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারিকরণের মাধ্যমে পানির দরে ব্যক্তি মালিকের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে, আমেরিকার সাথে বাণিজ্য চুক্তি হচ্ছে, বিরোধী মতের ওপর দমন-পীড়ন হচ্ছে – সেই একই চিত্রেই তো আমরা ফিরে আসছি। এই ঘটনাগুলো কেন ঘটে – সেটা দেখানো বামপন্থীদের কাজ। এখানেই শ্রেণি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি – এই বিষয়গুলো আসে। মানুষ যদি কারণটা ধরতে পারে, তবে সে হতাশ হয় না। এ কারণে লড়াইয়ের সাথে সাথে লড়াইয়ের দিকনির্দেশনা তৈরি করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা যারা সমাজের পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছি, তারা তো মানুষকে এটাও দেখাতে চাই যে, এই পরিবর্তনটা কীভাবে ঘটবে? এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমাদের করণীয় কী?

আমরা যুগে যুগে দেখেছি – মানুষ লড়াইয়ে নামে, জীবন দেয়। মানুষ দাঁড়ায়। এদেশের যুবক-তরুণরা কখনো রক্ত দিতে পিছপা হয়নি। তারা দাঁড়িয়েছে, বারে বারেই দাঁড়িয়েছে, জীবন দিয়েছে, আত্মবলিদান করেছে। কিন্তু সেই আত্মবলিদান কেন আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না, কী করলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে – এই দিকনির্দেশনা তৈরি করাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা যে দেশের মধ্যে আছি, সেটা যে একটা পুঁজিবাদী দেশ এবং পুঁজিবাদ যে মানুষের সংকটের সমাধান করতে পারে না, পরিবর্তনের জন্য যে সমাজের আমূল পরিবর্তন দরকার, একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দরকার, এই জায়গায় মানুষকে শিক্ষিত করা, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, সচেতন করা, সংগঠিত করা– এটাই যে কোন লড়াইয়ের মধ্যে করা দরকার। এই রাজনৈতিক সচেতনতার কাজ যতটুকু করা যায়, সেটাই লড়াইয়ের রক্ষাকবচ। শুধুমাত্র লড়াইয়ে নামিয়ে দিলাম আর সবাই লড়াই করল, জীবন দিল – এটা করেই লড়াই রক্ষা পায় না। এই কাজ করলেই পরিবর্তন ঘটে যায় না। আমরা ছোট-বড় সংগ্রামগুলোর মধ্য থেকে যতটুকু গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলতে পারব, সেটাই এই সংগ্রামগুলোর রক্ষাকবচ হবে। গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে লড়াই করতে করতে পরবর্তীকালে যে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি গড়ে উঠেছে – এটা তো একটা আন্দোলনের শক্তি। এভাবে যদি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আন্দোলনের শক্তি আমরা গড়ে তুলতে পারতাম, তাহলে কিন্তু এই শাসকগোষ্ঠী যা ইচ্ছা তাই করে পার পেতে পারত না। তখন জনগণ আবার লড়াই করত, মানুষ আবার রাস্তায় নামত।

আরেকটা ব্যাপার আমাদের মনে হয়, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা নৈতিকতার সুর তৈরি করা খুব জরুরি। যদি নতুন ধরনের নৈতিকতার স্ফুরণ না ঘটে, তবে আন্দোলন কেন? যে মানুষটা আন্দোলন করছে, জীবন দিতে দাঁড়িয়েছে – সেই মানুষদের মধ্যে যদি একটা নৈতিকতার সুর তৈরি না হয়, তাহলে কী ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে, সেটাও কিন্তু এবার আমরা দেখলাম। যারা গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিল, সেই মানুষদেরই খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দেখলাম পাল্টে যেতে। তাদের মুখের ভাষা, কথা, আচার-আচরণ, জীবন – গণঅভ্যুত্থানের পরে কীভাবে পাল্টে গেল! মানুষ আতঙ্কিত হয়েছে এই অবস্থা দেখে। অল্প কিছু টাকার কাছে, ক্ষমতার কাছে তারা বিক্রি হয়ে যেতে পারে – এটা মানুষ ভাবতেও পারেনি! আমরা চোখের সামনে দেখে শিখলাম যে, আন্দোলনের মধ্যে যদি একটা নৈতিকতার সুর তৈরি না করা যায়, জীবনবোধ তৈরি করা না যায় – তাহলে এত বড় আত্মত্যাগও কিন্তু বৃথা হয়ে যায়। এত মানুষ জীবন দিয়েছে আমাদের ডাকে, ফলে কোনোভাবে আমরা বিক্রি হব না; এই মানুষদের প্রতি আমাদের কমিটমেন্ট আছে, আমরা কারো দালালি করব না – লড়াইয়ের মধ্যে এই জায়গাগুলো তৈরি না করা গেলে গণঅভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আজকের নিপীড়িত আগামীকাল নিপীড়ক হয়ে দাঁড়ায়।

অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে মৌলবাদের উত্থান নিয়ে আলোচনা এসেছে এখানে। আওয়ামী লীগের শাসনকাল যদি আরও দীর্ঘায়িত হতো, তাহলে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর শক্তি ও ক্ষমতা কমত না বাড়ত? এ প্রশ্ন যে কাউকে করলে, যারাই একটু সচেতন, তারাই বলবে যে, আওয়ামী লীগের এই শাসনকাল দীর্ঘ হলে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো আরও শক্তিশালী হতো। আওয়ামী লীগের পতনের মধ্য দিয়ে মৌলবাদী শক্তি বরং উন্মোচিত হয়েছে। তারা মানুষের সামনে এসেছে, তাদের রাজনীতি মানুষের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। গণঅভ্যুত্থান না হলে এই গোষ্ঠীগুলো আরও ব্যাপক শক্তি নিয়ে সামনের দিনে আত্মপ্রকাশ করতো।

এখানে আমাদের দলের অনেক নেতাকর্মী উপস্থিত আছেন। তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে, জনগণের আন্দোলনের শক্তি যদি শক্তিশালী না হয়, আমাদের দলকে আমরাযদি শক্তিশালী না করতে পারি – তাহলে আজকের দিনে কোন গণঅভ্যুত্থান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। সত্যিকার অর্থে জনগণের সামনে সেই শক্তি নাই যারা জনগণের এই আন্দোলনকে একটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের সেই শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। প্রতিটি আন্দোলনে জনগণের সামনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের অপরিহার্যতা তুলে ধরতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য আমরা লড়ব, কিন্তু সেই লড়াইও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবেই। সমাজতন্ত্র ছাড়া, শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ছাড়া আজকে মানুষের মুক্তি কোনোভাবেই সম্ভব না। এই ব্যবস্থা বজায় রেখে কোন গণঅভ্যুত্থানই এই দেশের মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করতে পারবে না। আমাদের দেশের গত ৫৫ বছরের শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ফলে সেই ব্যবস্থা বদলের লড়াইকে আমরা শক্তিশালী করব, আমাদের দলকে শক্তিশালী করব, গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করব – সেই কথা বলে আজকের আমাদের এই আলোচনা সভার কাজ আমরা এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

সাম্যবাদ
১৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের কোনো আলামত নেই

● ১ম পৃষ্ঠার পর

নতুনভাবে যেন আরেকটা ফ্যাসিবাদী শক্তি জন্ম না হয়, সংস্কারের মধ্য দিয়ে সেটা নিশ্চিত করা। এই রাষ্ট্র সংস্কারের ঘটনা কি পৃথিবীতে আর অন্য কোন জায়গায় ঘটেনি? অন্য অনেক জায়গায় এরকম গণঅভ্যুত্থান হয়েছে এবং সংস্কার হয়েছে। তিউনিসিয়ায় গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটা নতুন সরকার ক্ষমতায় এলো। তারা দুই বছরের মধ্যে কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম করলো। পরবর্তীতে দেখা গেল আবার একটা অথরিটেরিয়ান গভর্নমেন্ট সেখানে এসেছে। তারা ২০২২ সনে এসে নতুন সংস্কার করল। এই সংস্কারের ফলে পুরনো বিষয়গুলোই আবার সংবিধানে চলে এলো। অর্থাৎ মানুষের মানবাধিকার, মানুষের নিরাপত্তা, মানুষের সুরক্ষা – এগুলো যে সংস্কার করলেই সবসময় নিশ্চিত হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু বলা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কার হাত দিয়ে এই সংস্কার হচ্ছে, কোন ধরনের মতাদর্শের মানুষ এটার পিছনে আছে, তাদের উদ্দেশ্যটা কী এবং তারা এই সংস্কার কাঠামোটাকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চায়।

কতগুলো সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছিল এবং সেই কমিশনগুলো খুব ভালো ভালো কিছু প্রস্তাবও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, অর্থনৈতিকভাবে আমাদের যে সংস্কারগুলো প্রয়োজন, সেই জায়গায় কোনো পরিবর্তন হয় নাই। বিএনপি সংস্কার করবে বলে করে নাই, এবং সংস্কারের নামে সুবিধামতো যেই কাঠামো গঠন করছে যেখানে জবাবদিহিতা নেই। সংস্কারের প্রতিশ্রুতিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সংস্কারের নামে জবাবদিহিহীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণই আমরা দেখলাম। আবারও প্রমাণ হল সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না করে শুধু রাজনৈতিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা সফল হয় না।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেটার যখন কোনো আলামত মানুষ দেখতে পাচ্ছে না, তখন মানুষ আসলে এই রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতি অনেকটা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। আবার এই সংস্কারের কথা দীর্ঘদিন ধরে চলছে অথচ সংস্কার হচ্ছে কি হচ্ছে না, হলো কি হলো না, এটা নিয়ে যে বিতর্ক থামছেই না – এসবে মানুষ আশাহত হচ্ছে। কিন্তু এতে গণঅভ্যুত্থানটা ব্যর্থ হয়ে গেল – তা আমি মনে করি না। আমি মনে করি যে এই গণঅভ্যুত্থানটা আসলে আমাদের জন্য একটা অ্যালার্মের মতো, একটা সতর্কতার মতো। সেই সতর্কতাটা হচ্ছে যে – জনগণের একটা শক্তি আছে, সেটা কোনোভাবেই দমিয়ে রাখা যায় না। যেকোনো স্বৈরাচারী শাসকের বারবার এটা মনে রাখা দরকার যে এইরকম একটা গণঅভ্যুত্থান আসন্ন, যদি সে মানুষকে সম্মান করতে না শেখে।

আমি এই সম্মানের কথাটা কেন বলছি? কারণ আপনারা দেখবেন যে আমাদের দেশে দারিদ্র্য আছে, বৈষম্য আছে। এখানে অর্থনৈতিক কাঠামোটা এমনভাবে বিন্যস্ত যে তীব্র শ্রেণিশোষণ চলছে এখানে। এই অর্থনৈতিক শোষণের সাথে যুক্ত হয়েছে শোষিত শ্রেণির প্রতি তীব্র অসম্মান, তাদেরকে মানুষই মনে না করা। এই অসম্মানবোধও গণঅভ্যুত্থান সংঘটনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের পরেও এর কোনো কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। সেই যে অসম্মান, সেটা রয়েই গেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় যখনই কোনো প্রতিবাদ বা আন্দোলন হতো, আমরা দেখতাম যে যারা সমন্বয়ক ছিল, যারা এনসিপির সাথে যুক্ত, তাদেরকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দিয়ে যমুনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর আমাদের সহযাত্রী যারা, আমাদের রিকশাওয়ালারা, আমাদের নার্সরা, আমাদের শিক্ষকেরা, আমাদের বিদ্যুৎকর্মীরা, তারা তাদের দাবি জানাতে গিয়ে রাস্তায় মার খেয়েছেন, টিয়ার গ্যাসের হামলার শিকার হয়েছেন। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সমাজেও বৈষম্য থেকে গেলো। এটা কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্য না, একটা মানুষকে তার মূল্যায়নের জায়গা থেকে অসম্মান। এই অসম্মান মানুষ নিতে পারে না। কারণ প্রতিটি মানুষেরই আত্মসম্মান আছে।

মানুষের শুধু অর্থনৈতিক সমতাই দরকার নয়, মানুষের এই সম্মানও দরকার। এই সম্মানটা যখন আমরা তাদেরকে দিতে পারব, তখন তারা এই প্রগতিশীল বা বামপন্থী রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হবে। সেটা দিতে আমরা অনেক সময় ব্যর্থ হই। ব্যর্থ হওয়ার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে যে, সম্মান সম্পর্কে মানুষের ধারণাকেই দিনে দিনে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। সম্মান বলতেই অনেকে এখন নিজের সুবিধার কথা চিন্তা করে। সকলের কথা সে চিন্তা করে না। সেই কারণে আমরা দেখছি যে যারা প্রচলিত রাজনীতিতে সক্রিয় হয়, তারা অনেক সময় সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে মিছিলে আসে। এখানে রাজনীতিটা এমনভাবে করাপ্টেড যে এখানে যারা আসে, তারা শুধু নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই আসে, তার কমিউনিটির স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরকে খুব দেখা যায় না। এই জায়গাটায় একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে ডান ও বাম রাজনীতির মধ্যে। তাদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গির তফাতটা রয়েছে, এটা আমাদেরকে বারবার মানুষের সামনে আনতে হবে। তাদেরকে দেখাতে হবে যে এইরকম এই অর্থের বিনিময়ে, সামান্য স্বার্থের জন্য মানুষ যে তার রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে – সেটা কোন নৈতিক মানদণ্ডেই সঠিক নয়। এই চিন্তা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বামপন্থী রাজনীতির উপরে তাদের আস্থা তৈরি করতে হবে।

আরেকটা কথা বারবার শুনি। সেটা হচ্ছে, এই যে নারীরা এত সামনে ছিল, সেই নারীরা কোথায় গেল? সবাই শুধু এই একটা কথাই জিজ্ঞেস করে। এই কথাটা বলার সময় আপনাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতাটা কারা দখল করেছে। যারা আসলে ক্ষমতাটা দখল করেছে এখানে, তারা তো কখনোই নারীকে সম্মান করে নাই। তারা তো নিজেদের দলের নারীদেরকেই সম্মান করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয় না। তারা আবার একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি যারা গণঅভ্যুত্থানের রাস্তায় ছিল, মাঠে ছিল, সামনে ছিল – তাকে কীভাবে সুযোগ দেবে? তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। এই পরিবেশটা যদি তৈরি না হয়, তাহলে আপনি যতই বলেন যে নারীদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না, যেতে দেওয়া হচ্ছে না, এটা তো কথাটা আসলে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হলো। নারীর জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

নারীরা যখন গণঅভ্যুত্থানে এসেছিল, সামনের সারিতে ছিল, সে কিন্তু মাথায় কল্পনা করে নাই যে আমি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করব। তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, প্রত্যাশার মধ্যে এগুলো ছিল না। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে এই সরকারের পতন হবে, এই সরকার আমরা দেখতে চাই না। কিন্তু পরবর্তীতে ঘটনাচক্রে যে বিষয়গুলো একটার পর একটা ঘটেতে থাকলো, উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান ঘটলো। তাদের এই উত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম আস্তে আস্তে এই পরিবেশটা আসলে নাই হয়ে গেছে। যেখানে নারীরা আরও ক্ষমতায়িত হতে পারত, সেই জায়গাটা এখানে নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই আমি যখন বলি যে নারীর ক্ষমতায়ন, এটা কিন্তু পুরুষের কাছে বলার কিছু নাই যে আপনি পুরুষদের দিক থেকে নারীদেরকে ক্ষমতায়িত করেন। এটা আসলে একটা রাজনীতি, যে রাজনীতি আসলে নারীদেরকে দমিয়ে রেখেছে, যে রাজনীতির কারণে আসলে এখানে নারীদের যেই জায়গাটা পাওয়ার কথা ছিল, সেই জায়গায় তারা যেতে পারেনি।

আমাদের এই প্রজন্মের অনেক নারী-পুরুষ যারা এই সময়ে গণঅভ্যুত্থানটা দেখেছে, এটা তাদের সামনের জীবনের জন্য এটা একটা শিক্ষা। এটা একটা প্রাপ্তি এই দিক থেকে যে, এটার মধ্য দিয়ে তাদের যে রাজনৈতিক বোধ আরও শাণিত হবে। আমি মনে করি এটা আমাদের শেখার জন্য একটা বড় সুযোগ ছিল। কারণ সভ্যতা কিন্তু একটু একটু করে আগায়, সংস্কার কিন্তু একটু একটু করে আগায়। মানুষের মধ্যে যে চেতনা, মানুষের মধ্যে যে বোধ, জীবনবোধ সেটাও কিন্তু কালক্রমে পরিবর্তন হয় এবং মানুষ সেটার সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে শেখে। কাজেই অনেকগুলো পারসপেক্টিভ থেকে গণঅভ্যুত্থানকে দেখার দরকার আছে। আমাদের একটা বদ্ধ ধারণা নিয়ে বসে থাকলে হবে না। আমাদেরকে অনেক মানুষের কথাগুলো শুনতে হবে এবং নিজের কোনো থিসিস এখানে হাজির করার আগে বুঝতে হবে যে আসলে আমার পাশের মানুষটা এই গণঅভ্যুত্থানকে কীভাবে দেখছে। এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। মাঠের আন্দোলনের সাথে এগুলোর একটা একাত্মতা তৈরি করতে হবে। এভাবে আমাদের মধ্যে একটা ঐক্য তৈরি হবে। সেটা যদি আমরা ধরে রাখতে পারি, তবে নিশ্চয়ই সামনের দিনে এই রাজনীতির একটা আশা আমি দেখতে পাই। সবাইকে ধন্যবাদ।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রাণ

● ২য় পৃষ্ঠার পর

সুতরাং এই বহুমাত্রিক কাজ, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ, পাঠচক্র, পাঠাগার এবং অন্যান্য যত ধরনের কাজ আছে, সবগুলো কাজই বাড়ানো দরকার।

লেনিনের একটা কথা আছে, "যেখানেই জনগণ আছে, যেখানেই জনগণের লড়াই আছে, সেখানেই আমাদের থাকতে হবে।" এটা খুব পরিষ্কার একটা কথা। খুব সহজ কথা। এই কথাটা মনে রাখলেই কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান হবে। সেইক্ষেত্রে আমি আশা করি যে, আজকে যারা এখানে আছেন তারাও বহুদিক থেকে এই ভূমিকা পালন করবেন এবং আমাদের সবার দিক থেকেই, সবদিক থেকেই এই চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এই চেষ্টাটা অব্যাহত রাখতে পারলে আমরা বুঝতে পারব যে, ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান আমাদের একটা শক্তির জায়গা, আমাদের একটা আত্মবিশ্বাসের জায়গা এবং আমাদের আত্মপর্যালোচনারও জায়গা। এটা নিজেদের পর্যালোচনার এবং সাহসেরও জায়গা। আমাদের নিজেদের অর্জনকে নিজেরা অবহেলা করলে হবে না, নিজেদের অর্জনের ওপরেই নিজেদের দাঁড়াতে হবে এবং দাঁড়িয়ে আরও বড় অর্জনের দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই প্রত্যাশা রেখে এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি।

রাষ্ট্রায়াত্ত কারখানা বেসরকারিকরণ

● ৫ম পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে তুলে, পরে তারাই সেই ব্যর্থতার দায় রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পের ওপর চাপিয়ে বেসরকারিকরণের পথকে একমাত্র সমাধান হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জনগণের অর্থে গড়ে ওঠা জাতীয় সম্পদ কেন কিছু দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর মুনাফার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে?

বিশ্বব্যাপী নব্যউদারবাদী অর্থনৈতিক নীতির অংশ হিসেবেই গত চার দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, বন্দর, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন ও সেবাখাত বেসরকারিকরণের ধারা চালু হয়েছে। তার ফলে বহু কর্মসংস্থান কমেছে, শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা নষ্ট হয়েছে, মজুরি ও শ্রম অধিকার সংকুচিত হয়েছে, সেবার খরচ বেড়েছে এবং জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ক্রমশ কর্পোরেট গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এভাবে রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হলে ভবিষ্যতে দেশের শিল্প আরও বেশি আমদানি নির্ভর ও বিদেশি পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

এর সমাধান কী

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সংকটের সমাধান বেসরকারিকরণ নয়; প্রয়োজন আধুনিকায়ন, উৎপাদন ও বিপণনের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জাতীয় শিল্পায়নের দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন করা। জনগণের সম্পদ জনগণের স্বার্থেই পরিচালিত হতে হবে। জাতীয় সম্পদকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফার উৎসে পরিণত করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, যুবক, ছাত্র এবং সচেতন নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি।

অত্যাবশকীয় ওষুধের তালিকা-২০২৬ বাতিল

● শেষ পৃষ্ঠার পর

এরমধ্যে কোর লিস্টেই আছে ৪১৪টি ওষুধ। বাংলাদেশে ২০০৮ সালের সরকারি গেজেটে প্রকাশিত অত্যাবশকীয় ওষুধ তালিকায় ছিল ২০৯টি ওষুধ, ২০১৬ সালের ওষুধনীতিতে সেই তালিকা সম্প্রসারিত করে ২৮৫টি ওষুধের তালিকা করা হয়েছিল এবং সর্বশেষ ২০২৬ সালের জানুয়ারির সরকারি আদেশে এই তালিকা ছিল ২৯৫টি ওষুধের। কেবলমাত্র আইনসঙ্গত হয় নাই, এই যুক্তি দেখিয়ে সরকার ২০২৬ সালের এই সরকারি আদেশটি বাতিল করলেন এবং ১১৭টি মান্ধাতার আমলের ওষুধের তালিকা কার্যকর করলেন। জনগণের কাছে মুখরক্ষার জন্য তারা বললেন, আরও উন্নত একটি তালিকা তারা আইসম্মতভাবে প্রস্তুত করবেন।

মাত্র দুইমাস আগে 'বিআইডিএস' তাদের রিপোর্টে প্রকাশ করেছে- বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই রোগীকে বহন করতে হয়, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা পায় না। দরিদ্র মানুষ তাদের আয়ের ৩৫ শতাংশ চিকিৎসার জন্য খরচ করেন। ফলে এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে, চিকিৎসা ব্যয় অসহনীয় করে তুলবে। তাই অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

সাম্যবাদ

১৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৬

সাম্যবাদ-এর ফেসবুক পেইজ ফলো করতে স্ক্যান করুন

রাষ্ট্রায়াত্ত কারখানা বেসরকারিকরণ

জনগণের সম্পদ তুলে দেয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে

ক্ষমতায় এসে বিএনপি সরকার বিগত সরকারগুলোর মতোই রাষ্ট্রায়াত্ত কলকারখানাগুলোর ঢালাও বেসরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন খাতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারা এর নাম দিয়েছেন 'রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প পুনরুজ্জীবন'। বিগত সরকারগুলোর মতোই সেই মুখস্ত কথা সরকার বলে চলেছে – 'এর মাধ্যমে লোকসানী ও বন্ধ রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানাগুলো আবার চালু হবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে, রাষ্ট্রীয় অপচয় কমবে, আমদানি নির্ভরতা কমবে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরকারের এ কাজে প্রধান ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে গত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় আচমকা দৃশ্যপটে হাজির হওয়া আশিক চৌধুরীকে। তার তৎপরতায় চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়ার চর ও পানগাঁও টার্মিনাল ৪৫ বছরের জন্য অসম শর্তে ও অস্বাভাবিক দ্রুততায় বিদেশী কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত বিতর্কিত আশিক চৌধুরীকে নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার বিডার চেয়ারম্যান হিসেবে বহাল রেখেছে। ইতোমধ্যে বিডা দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ১০০টি রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে, এর মধ্যে ৪৪টি কারখানার তালিকা প্রকাশ করেছে। এ তালিকায় রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলের পাশাপাশি আছে ১৩টি চিনিকল, দেশের একমাত্র গাড়ী সংযোজনকারী ● এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়

অত্যাবশকীয় ওষুধের তালিকা-২০২৬ বাতিল সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যয় অসহনীয় করে তুলবে

সম্প্রতি মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে 'অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা ২০২৬' এবং 'ওষুধের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ২০২৬' বাতিলের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে আজ থেকে পুনরায় দেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৯৯৪ সালের আদেশে প্রণীত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা এবং সেসব ওষুধের সরকারি মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা বহাল থাকবে। অর্থাৎ বর্তমানে দেশে অত্যাবশকীয় ওষুধ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে ৩২ বছর আগে তৈরি করা ১১৭টি ওষুধের তালিকা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিবেচনায় 'অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ' হলো সেই ওষুধগুলো- যা একটি দেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অগ্রাধিকারমূলক স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ করে। যে কোন দেশের সরকার তার দেশের জনগণের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি অনুযায়ী অত্যাবশকীয় ওষুধের তালিকা সম্প্রসারণ করে। এই ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য সরকার নির্ধারণ করে দেয় এবং ওষুধ কোম্পানিগুলো এর বেশি দাম নির্ধারণ করতে পারে না।

১৯৯৪ সালের তালিকায় ডায়াবেটিসের মতো রোগের ওষুধকেও অত্যাবশকীয় ওষুধ হিসেবে ধরা হয়নি। হাইপ্রেশারের মাত্র দুইটি ওষুধ (যা খুব কম ব্যবহৃত হয়), কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক, প্যারাসিটামল, অ্যান্টাসিড, কিছু জরুরি টিকা ও কিছু প্রয়োজনীয় অ্যানেস্থেশিয়ার ওষুধ এই তালিকায় আছে। ৩২ বছর আগে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকও এখন পুরনো, রেজিস্ট্যান্সের কারণে বর্তমানে এইসকল অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সীমিত। এই ৩২ বছরে দেশের মানুষের রোগের ধরন পরিবর্তনসহ চিকিৎসার নানামুখী পরিবর্তন হয়েছে- কিন্তু অত্যাবশকীয় ওষুধের তালিকার পরিবর্তন হয়নি।

১৯৯৪ সালের পর বাংলাদেশে মোট ৩ বার (২০০৮, ২০১৬ ও সর্বশেষ ২০২৬ সাল) অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা হালনাগাদ বা নতুন করে প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে সরকারি আদেশের পরও আইনি জটিলতার কথা তুলে কিংবা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি করে কোনোটিই শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হয়নি। ওষুধ কর্পোরেটদের চাপে আমরা ১৯৯৪ সালের তালিকা নিয়েই আছি এবং এর ফলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের দাম কোম্পানিগুলো যথেচ্ছা বাড়াচ্ছে। এমনকি বাজারে একই ওষুধের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দুই থেকে তিনগুণ পর্যন্তও দামের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

বর্তমানে বাজারে প্রায় ১,৩০০ থেকে ১,৪০০টি জেনেরিক ওষুধ রয়েছে। কিন্তু ১৯৯৪ সালের আদেশের কারণে সরকার মাত্র ১১৭টি ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যার সুযোগ নিয়ে বাকি ১২শ'এরও বেশি ওষুধের দাম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো নির্ধারণ করছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের উপর বিপুল আর্থিক চাপ তৈরি হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতি ২ বছর পরপর এই তালিকাটি হালনাগাদ করে। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালে প্রকাশিত ২৪তম মডেল তালিকায় মোট ৫২৩টি ওষুধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ● এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জুলাই সমাবেশ

জারতাজ পারভীন (শহীদ আহনাফের মা)

গত ৬ আগস্ট, বিকাল ৪ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে 'জুলাই সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশ শুরুতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদিতে আলোচকবৃন্দ, শহীদ পরিবারের সদস্য এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদের সঞ্চালনায় এবং সভাপতি সালমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শহীদ শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফের গর্বিত মাতা জারতাজ পারভীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক তানজীমউদ্দিন খান এবং বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা। সংগীত পরিবেশন করেন ওয়ার্দা আশরাফ, অরূপ রাহী, হুমায়ুন আজম রেওয়াজ, সমগীত ও কোরাস।

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সিলেটের চা বাগানে আন্দোলন

দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ, ২০২৩ সালের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী গেজেট বাতিল, ভূমির অধিকার বাস্তবায়ন এবং আট বছর ধরে বন্ধ থাকা চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন চা বাগানে আন্দোলন জোরদার হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে শ্রমিকরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন।

মালনীছড়া, গংগারজুম, লালাখাল ও ছড়াগাংসহ বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা সমাবেশ ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

শ্রমিকদের চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে– (১) ২০২৩ সালে প্রণীত চা শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী গেজেট বাতিল করে দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ, (২) চা শ্রমিকদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা, (৩) দীর্ঘ আট বছর ধরে বন্ধ থাকা চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অবিলম্বে আয়োজন করা এবং (৪) বছরে মাত্র ৫ শতাংশ বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের গেজেট বাতিল করে বর্তমান মূল্যস্ফীতি ও বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন মজুরি বোর্ড গঠন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে ৫ আগস্ট বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে 'গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট'-এর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা। বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন- সিপিবি'র সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন প্রমুখ।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩, ০১৭১১-৪৪০২৬৫। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org